গল্পসমগ্র

জয়া মিত্র

পুনশ্চ

নিবেদন

'যা কিছু আমি লিখব, নিজে জেনে, বোধ করে লিখব' এই শর্ত মেনে লিখছিলেন গণেশ। যে গণেশ ভারতের প্রথম লেখক এবং লিখছিলেন জীবনের বিপুলতম গাথা—মহাভারত। হয়তো এই একই শর্তে লেখেন সব লেখকই। তাই কোনো লেখা সম্ভব হয় না নিজের সমকালকে এড়িয়ে। সেই সমকাল তো একবর্ণ একস্তর নয়, যত দিক থেকে দেখি কালের সঙ্গে মিলে থাকা জীবনকে-নানাদিক থেকে ঠিকরে পড়ে তার আলো ও অন্ধকার। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির, সামাজিক স্তরের সঙ্গে স্তরের, পুরুষের নারীর অন্তর্জীবন ও আন্তর্জীবন, ধরা রয়েছে নানারঙের, নানাসুতোর এক ঘন বুনোটের মধ্যে। দেশ প্রসারিত হয়ে যায় দেশান্তরে, সমকালের দুইপ্রান্ত নিত্যপ্রবহমান অতীতে ও ভবিষ্যতে। সেই ধারার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে থাকতে, ভেসে উঠতে উঠতে-সম্পৃক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতার সম-বাসে লেখকের প্রয়াস জীবনের কিছু চিহ্ন কিছু অভিজ্ঞান শব্দে ধরে দেবার।

বিংশ শতকের মাঝখানে, যেন এক জলবিভাজিকার চূড়ায়, আমাদের জন্ম। এই উপমহাদেশের স্বাধীনতারই কাছাকাছি বয়স দেশভাগ দাঙ্গা বিশ্বযুদ্ধের। বিশ্বযুদ্ধের আগে আর পরে চিরে দুইভাগ হয়ে গেছে সমাজ সংসার মূল্যবোধে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। সেই বিভাজনরেখায় টলতে টলতে আমাদের উঠে দাঁড়ানো। হাঁটবার চেষ্টা। কথা বলা। স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প শুনে আর নানা ফন্দিফিকির দেখতে দেখতে আমরা বেড়ে উঠেছি। ঘৃণা অথচ ভালোবাসা মনকে মুচড়ে বিহ্বল করে রেখেছে তীব্র সঙ্গমের মতো আলিঙ্গন ও ভিন্নতায়। বাইরের অসংখ্য ঘটনার অভিঘাত আর তাদের জটিল কার্যকারণ ব্যাখ্যা, বোধ-এই নানান আন্দোলন, নানানতরো আপোষ, এইসবের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমাদের লেখা তৈরি হয়ে উঠেছে।

যেখান থেকে চলা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে অনেক মোড় ফেরা হল। পথে পথে বাঁক নেওয়া হল অনেকবার। কখনও অনেকজনের সঙ্গে, কখনও একেবারে বিজন একা। প্রতিটি বাঁকের মুখ থেকে উঠে এল মানুষের মুখ। সেইসব মুখই গল্প হয়ে গেল।

কী এক সখ্যতাময় অমল সৌন্দর্যে পৌঁছবার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু ছিল, আজ দেখছি জীবন বেয়ে চলাই প্রাপ্তি। মানুষকে তার জীবনযাপনের মধ্যে দেখতে দেখতে মনে হয়—কী যেন আমার বলবার ছিল, বলা গেল না। সেই শব্দ খুঁজে পেলাম না এখনো, যা সেই দৈনন্দিন জীবনের ধৃতিশীল চলমান বিশাল রহস্যরূপকে প্রকাশ করতে পারবে।

এক পুবালি বাতাসের জোয়ারে ভেসে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কত নদীর পাশ দিয়ে, কত উচ্ছেদ হওয়া গ্রামের ধার দিয়ে, নিজেদের নতুন করে খুঁজে পাওয়া কত মানুষের অঙ্গন হয়ে সে রাস্তা চলে যাচ্ছে। আরও কোথায় যাবে, ম্যাজিকলণ্ঠনে চোখ রেখে আরও কী দেখাবে, সেই টানে তার সঙ্গে চলা। আর কী যে মায়া সেই মাটির, সেইসকল মানুষের জীবনযাপনের যাকে আমার নিজের ভাষায় বলে জীবনযাত্রা। সেই মানবধারা কোন করুণায় আগ্রহীজনকে দেখতে শেখাল তার পটভূমির স্থান কাল।

আশ্চর্য মনে হয়, আমার যে ভাষায় শব্দের দৈন্যমাত্র নেই, দুই বিরাটকে বোঝানোর জন্য সে ভাষায় একই শব্দ ব্যবহৃত হয়—দর্শন। সে কী তবে এইজন্য যে দেখা-মনস্ক একাগ্র দেখার সঙ্গেই সম্পর্কিত জীবন সম্পর্কে কোন নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা? যেই দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া মনুষ্যজীবন

নামে এই অসামান্য যাত্রার মধ্য দিয়ে চলার কোন অভিজ্ঞান থাকবে না। 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' তার অর্থ আমার নিজের বোধের দর্পণে প্রতিফলিত হবে কোথা দিয়ে যদি দেখার চোখের সঙ্গে সঙ্গে দেখার অর্থকে মিলিয়ে নিতে না পারি অভিজ্ঞতায়? চলার পথে জীবন হাত ধরে শেখায় সেই দৃষ্টি। হয়তো সর্বদা সুখের নয় সে জানা, কিন্তু সেও তো পথ। চলারই অংশ। সে পথের ভাঙা মানুষ, ঝরা মানুষ, পড়তে পড়তেও অন্যের হাত ধরে তুলে দেওয়া মানুষ—এঁরা আমার গল্প জুড়ে বসেছেন। এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি অনায়ত্ত সেই মাধুরীকে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাবার যা মানুষকে এতদূর নিয়ে এসেছে সব দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, বিশ্বাস করিয়েছে যন্ত্রণারাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের স্বপ্নে। একের পর এক স্বপ্ন ভেঙেছে কিন্তু শত হতাশার আঘাতেও ফুরোয়নি আবার স্বপ্নদেখার বিশ্বাস।

সে বিশ্বাসকে ধরে রাখা আজ আবার জরুরি হল। সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে কঠিন হল পথ দেখতে পাওয়া। কেবল বর্তমানের সংকীর্ণ খোপে টিকে থাকার, প্রত্যক্ষকে নিয়ত অস্বীকার করে এক পরাবাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস আচ্ছন্ন করছে সামাজিক এক অংশ। ছত্রাকের দ্রুতিতে বিস্তার পাচ্ছে এই বালিতে মুখ গুঁজে পিঠে আঁচ লাগানোর ভাবনা।

মাঝদুপুরে মেঘে ঘন হয়ে আসা আকাশের নীচে অর্জুনগাছের পাতাগুলি থিরথির করে কাঁপত, পুকুরের ছোট্ট জলে একটিমাত্র বেগুনি শালুক—মনে হয় কী একটা মানে থমকে আছে চারপাশের বাতাসে থমকে আছে চারপাশের বাতাসে, আমি কেবল বাইরে রয়ে গেলাম, তাকে বুঝতে পারলাম না। অপেক্ষা ছিল বোধের চোখ খোলার। কিন্তু জ্বলে যাচ্ছে শিশু-অর্জুনের দল, অপসৃত বেল বট অশথের ছায়ার নীচে টুপজলের পুকুর। বিচ্ছিন্ন কৈশোর। ঝড়ে উড়ে আসা পাথরকুচির মতো আঘাত করছে মুষ্টিমেয়ের লোভ।

মানুষ যেখানে সবচেয়ে সুন্দর—তার সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপনে, সেখান থেকে উপড়ে তুলে কোটি কোটি মানুষকে ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলা হচ্ছে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো। যেখানে মানুষের বাস, হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে মানুষ গড়ে তুলেছিল তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, সেই প্রকৃতি আর তার ধাত্রী পৃথিবীকে কিছু লোকের উচ্ছিন্ন খেয়ালখুশিতে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করার নাম দেওয়া হল—অগ্রগতি। এই সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করবে একজন লেখক? যে ঠিক করেছে 'কোনো কথা লিখব না, না বুঝে?' যখন প্রতিদিন ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ন্যায় আর অন্যায়ের, শুভ আর সর্বনাশের, আনন্দ আর অসূয়া, হার আর জিতের ধারণাকে—কী কাজে তখন নিজের অস্তিত্বকে নিয়োগ করবে যেমনভাবে একজন করেছিল শস্যখেতের জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে? মানুষের নিজের মুখ তার নিজের কাছেই ঝাপসা হয়ে উঠছে, উচ্চকিত প্রচারের নিনাদে ভাঙা, বেঁকে যাওয়া আয়নার মতো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে স্বপরিচয়ের ছবি।

এই মুহূর্তে সেই হারিয়ে যেতে থাকা পরিচয়কে ধরে রাখা, ছিঁড়ে যাওয়া শেকড়ের কথা বলাই বুঝি লেখকের স্ববৃত কাজ। তার কাজ প্রশ্ন করা। তার কাজ বিশ্বাস ধরে রাখা। অসংখ্য ছোটো ছোটো টুকরোয় ভেঙে ছড়িয়ে যাওয়া মুখের মলিন কাগজের মতো কোঁচকানো ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে প্রতিদিনের শহুরে বাতাসে। এই খণ্ড পরিচয়ের পেছনে যে বৃহত্তর সমকাল—যেখানে আজকে দেখতে পাওয়া অনেক উত্তরের শুরুর প্রশ্নগুলো নিহিত, তার কথা আরও যত্ন নিয়ে খুঁজে বার করা, আর একমনে, পরম যত্নে আমার কালকে তার নিজের গল্প, আমাদের গল্প বলে যেতে থাকা—মনে হয়, এই যেন আমার করার কাজ। অন্ধকারের আলোর প্রদোষের গল্প বলে যাওয়া।

বইমেলা, ২০১৮ জয়া মিত্র

সূচিপত্র

কালপরশুর ধারাবাহিক / ১১
যাত্রা / ২২
দ্রৌপদী / ২৯
স্বজন বিজন / ৩৮
অমরলতা / ৪৯
অন্ধকারের উৎস থেকে / ৬৯
হেনরি মুর ও তার শিশু / ৭৫
যাতায়াতের গল্প / ৮৪
ফিরদৌস আসেনি / ৮৯
ঘৃণার সমস্যা / ৯৯
স্বাধীনতার যমজ / ১০৯
বোঝা / ১১৭
তিমির বিদার / ১২৩
আগুন লাগার আগে / ১৫৪
চক্রবৎ / ১৭১
নদীর নাম ধারাবতী / ১৮৬
খেয়া / ২১২
শেলটার / ২২১

তারা দুইজন / ২৩৩
দ্বিতীয়বার / ২৪৩
দিনগুলি / ২৫৪
খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া / ২৬১
লোকশিক্ষা / ২৬৭
নিয়ন্ত্রণের অধিকার / ২৭৫
অস্বচ্ছ / ২৮৫
তাম্রসরস্বতী / ২৯৩
মঞ্জুলির জন্য / ২৯৯
পুরোনো বাসন / ৩১৯
জীবনচরিত / ৩৩১
উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী / ৩৪২
কুরুক্ষেত্রের আগে / ৩৫০
একজন যশোদাদি / ৩৫৯
নিবিড় পাঠ / ৩৬৯
দেশভ্রমণ / ৩৭৯
সূর্য ও সাদাপাখিটি / ৩৮৫
সহযাত্রিণী / ৩৯৩
সুমন / ৪০১
সম্পর্ক / ৪০৬
পাথরজন্ম / ৪১৮
কাঁকর-মাটি / ৪২৩
অকাজের বউ / ৪৩০
কাছে যাওয়া / ৪৩৪
খোলা হাওয়া / ৪৪৫
অভাগীর নিজের স্বর্গ / ৪৫৪
মেঘদূত / ৪৬০
শোকগাথা / ৪৬৬
সাধন ও তার পথঘাট / ৪৭৬
ঘরনি গৃহিণী / ৪৮১
বেদি আর বুড়ি / ৪৮৬

॥ কালপরশুর ধারাবাহিক ॥

পাটনাগামী দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায় বসে আছেন শ্রীনন্দা। গাড়ি ছেড়েছে তাও ঘণ্টাদুয়েক হয়ে গেছে। বাংলা পেরিয়ে আর একটুক্ষণের মধ্যেই বিহারে ঢুকে পড়বে। ইচ্ছে করলে একটু শুয়েও নিতে পারতেন, নীচের বার্থের রিজার্ভেশন তাঁর, একটু আগে মনে হচ্ছিল পিঠটা যেন ধরা ধরা লাগছে, তবু ঠিক শোয়া গেল না। এই বিকেলবেলা কি শোয়া যায়! অন্যরা বসে আছে আশপাশে। বেশি কেউ নয় অবশ্য, চারজনের এই কুপেতে একটি কমবয়সি ছেলে ছাড়া সামনের বার্থে বসে আছেন এক মহিলা তাঁর সঙ্গে একটি ছোটো ছেলে। নিশ্চয়ই নাতি। বছর দশেক হয়তো বয়েস হবে কি বারো কিন্তু শ্রীনন্দা কিছুটা অন্যমনস্কভাবেও খেয়াল করেছেন ছেলেটি ওর বয়সি বাচ্চাদের তুলনায় শান্ত। কথাও বিশেষ বলছে না। জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে চেয়ে আছে। শ্রীনন্দার ওপরের বার্থের ছেলেটি ব্যাগ সুটকেশ যথাস্থানে রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। সে শ্রীলার সঙ্গে একই স্টেশন থেকে উঠেছে। হয়তো তার বন্ধুবান্ধব আছে অন্য কোনও কামরায়। এখানে দুই বয়স্কা মহিলার সঙ্গে বসে থাকাও তো অস্বস্তিকর তার পক্ষে।

শ্রীনন্দা পা নীচে নামালেন। এখনও পা নামিয়ে চটি খুঁজতে গেলেই প্রায় অব্যর্থভাবে মনে পড়ে যাবে রোমান হলিডে-তে অড্রে হেপর্বানের সেই বিশাল গাউনের ঘেরের মধ্যে জুতো খোঁজার কথা! কি অভিনয়! কে বলবে চঞ্চল সপ্তদশী রাজকুমারী নয় ও। কতদিন হল তারপর, কিন্তু সেই কিশোরকালের মুগ্ধতা। আন্দাজে আন্দাজে পা ঢোকালেন চটিতে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ব্র্যাকেটের হুক থেকে ওয়াটারবটল নামানোটা তো ছুতো, আসলে পিঠ কোমর একটু সোজা করা। পিঠের ব্যথাটা বহুদিনের সঙ্গী। বলতে কি খুব বাড়াবাড়ি না হলে ওটাকে আর খেয়ালও হয় না তেমন করে, বরং ব্যথাছাড়া পিঠ যে কেমন তাই ভুলে গিয়েছেন। এখন এই আড়ষ্ট ভাবটা ঠিক একটানা বসে থাকার কারণেও নয়, একটানা চার-পাঁচ ঘণ্টা টেবিলে বসে কাজ তিনি এখনও নিয়মিতই করেন, এটা বোধহয় অনেকক্ষণ গাড়ির ঝাঁকনির জন্য। নিজের মনে নিজেকেই হালকা তিরস্কার করলেন, অনেক রাস্তা বাকি এখনও। কাল ভোরে এই গাড়ি পৌঁছবে, রিটায়ারিং রুমে থাকবেন, সকাল নটার মধ্যে উদ্যোক্তারা আসবে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে রেডি হয়ে নিতে হবে তার আগে। কাল সমস্তদিন ঘোরাঘুরি আছেই। গত দুদিনও যথেষ্ট অনিয়ম হয়েছে। বাইরে থেকে তাঁকে দেখে ক্লান্তি বিশেষ বোঝা যায় না, কিন্তু চুয়ান্ন-পঞ্চান্নর শরীর ভিতরে ভিতরে অবসন্ন হয় মাঝেমাঝে। যদিও কাজ করার ক্ষমতায় তিনি এখনও যে কোনও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের সঙ্গে পাল্লা

দিতে পারেন। কিন্তু সে তাঁর কাজের প্রতি ভালোবাসার কারণে। জীবনকে এরকমভাবেই নিয়েছেন শ্রীনন্দা, ব্যক্তিগত জীবন একেবারে ছকে বাঁধা নিয়মনিষ্ঠ। এমনকি ব্যক্তিগত ভাবনারও বিশেষ জায়গা রাখা নেই সেখানে। বাকি সমস্ত সময়টা তাঁর নিজের কাজ আর কাজের ভাবনা দিয়ে ভরাট করা। সপ্তাহে দুদিন টিয়া ফোন করে কলকাতা থেকে। নিজেদের খবর জানায়, মায়ের খবর নেয়। এখন আর ওর সংসার নিয়েও বেশি মাথা ঘামান না শ্রীনন্দা। পাঁচ-সাত বছর হয়ে গেছে, অনীশের সঙ্গে মোটামুটি একরকম বোঝাপড়ার সম্পর্কও দাঁড়িয়েছে মনে হয়। আর কি! যে যেখানে আছে নিজের মতো করে ভালো থাকুক। আর তো দুশ্চিন্তা করে, বুঝিয়ে, নিজের মনোমতো করে কাউকে চালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। ওতে কারও সত্যি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না, হলে তাতেই তাদের ভালো হয়েছে কি না—এসব কিছুই তাঁর জানা নেই। একসময়ে তাঁর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেননি কি তাঁকে নিজেদের মনোমতো 'ভালো' করে তুলতে? তিনি নিজে করেননি অন্যদের? আজ মন শান্ত হয়েছে, একরকম দূরত্ব এসেছে সবারই কাছ থেকে। এসেছে? এতদিন তো তাই ভেবেছেন। কিন্তু তাহলে আজ সকালে কি করে ওরকম সমস্ত রক্ত মুখে কানে উঠে এসেছিল ওই লোকটিকে দেখে? প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান থেকে চিনে নিতে একমুহূর্ত দেরি হয়নি অথচ সবাই জানে তিনি লোকের মুখ ভুলে যান, নাম ভুলে যান। সবাই জানে। সবাই তো কতকিছুই জানে, অথচ নিজের মনকে কি কোনওদিন শেষ করে জানতে পারে মানুষ! তিনি কি কখনও জেনেছিলেন এতখানি জ্বালা তাঁর মধ্যে এখনও আছে!

সমানের বার্থের বাচ্চা ছেলেটি সঙ্গের মহিলাকে কি একটা দেখাচ্ছে, জানলার বাইরে নির্দেশ করে। আপনা থেকেই শ্রীনন্দার চোখও বাইরে গেল। মাঠ ঝোপ, কিছু কিছু ঘরবাড়ি, কে জানে কোনটা ওর মন টেনেছে! এদিকের মাটি লাল, উঁচুনীচু। লাইনের পাশে খেত বলতে বিশেষ নেই, এলোমেলো ঝোপঝাড় আর বিশাল বিশাল ফাঁকা মাঠ। কাঁকুরে উঁচু জমি, নির্জল। কেমন রুক্ষ চেহারা। মার্চের মাঝামাঝিতেই হাওয়ায় আঁচ।

সামনের মহিলা তাঁর থেকে বয়সে খুব একটা বড়ো হবেন কি? মনে মনে বুঝবার চেষ্টা করেন শ্রীলা। এটা প্রায় একরকম অভ্যেসই হয়ে উঠেছে, নিজের কাছাকাছি বয়সের মহিলাদের খেয়াল করা। অধিকাংশেরই চেহারায় মুখচোখে কি রকম হাল ছেড়ে দেওয়া ঢিলে ভাব। তাঁকেও কি এতটাই বয়স্ক দেখায়! দেখায় যে না সেকথা নিজেও জানেন অবশ্য। কেবল দেখানোর প্রশ্ন নয়, তিনি অনুভবও করেন না সেভাবে। নিজেকেই বোঝান—এ সব খেয়াল করবার, ভাববার সময় কোথায় তাঁর! তাছাড়া, বাড়াবাড়ি না করেও তিনি নিজের যত্ন নেন। আসন করেন, খাওয়াদাওয়ার নিয়ম মানেন।

বড়ো জংশন। স্টেশনে ঢুকছে গাড়ি। লাইন ভাগ হয়ে হয়ে যাচ্ছে। ছোটোবেলায় এইসময়ে কি চিন্তাই না হত, যদি ড্রাইভার ঠিক লাইনটা চিনতে না পারে! যদি প্লাটফর্মে না পৌঁছে অন্যদিকে চলে যায়! মা বলতেন, যারা কাজ করে তারা সব জানে। এই ট্রেনটা এই রাস্তা দিয়ে রোজই যায়, ওরা ভুল করে না। মা বড়ো বিশ্বাস করত। মানুষকে, ব্যবস্থাকে,

যা বরাবর হয়ে আসছে তাকে। মা বিশ্বাস করত ধৈর্য ধরে থাকায়, সময়মতো সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ায়। মায়ের পৃথিবী খুব শান্ত ছিল। দুঃখ ছিল, সেও কেমন একরকম বিজড়িত দুঃখ। শ্রীনন্দা ছোটোবেলা থেকে সব কিছু নিয়েই সংশয়ে থাকতেন। ভয় হত। যেটা হবার কথা যদি তা না হয়! পরীক্ষার রেজাল্ট বেরবার আগে ভয়ে আতঙ্কে যেন দম আটকে আসত। অথচ বরাবরের ভালো ছাত্রী ছিলেন তিনি। মেধার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতেন নিয়মিত পরিশ্রমের নিশ্চিতিতে। ভাইদের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মায়ের চেয়ে বেশি অস্থির হয়ে উঠতেন। বিয়ের পর যখন দেখলেন সুধন্যর অফিস ছুটি হবার সময়ের সঙ্গে বাড়ি ফেরবার সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই, কিরকম অসহায় লাগত, কখন তবে ফিরবে তুমি? আমি কি করে জানব যে কখন ফিরব? সদ্যবিবাহিত বাইশ বছরের মেয়েটির উদ্বেগকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল ঊনত্রিশের সুধন্য।

জানবার কি আছে! ফিরলে তো দেখতেই পাবে!

বারে! অফিস থেকে বাড়ি আসবার একটা সময় থাকবে না!

অফিস থেকে বাড়ি আসি না আমি। আবার আসব আবার যাব—ধুর। একেবারে আড্ডাফাড্ডা মেরে ফিরি। বরাবর ওটাই হ্যাবিট—

যেন বিয়ের আগেকার 'হ্যাবিট' এখন বাড়িতে আসা নতুন লোকটির জন্য পালটাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, এমন নিশ্চিতভাবে বলে দিত কথাটা। শ্রীনন্দার এখনও মনে পড়ে সেইসব একা একা ভয় পাওয়ার কথা, দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা। মাকে বললে মাও বলতেন,

কি করবি? ব্যাটছেলেদের একটা আড্ডা দেওয়া তো থাকবেই, ওটুকু মেনে নিতে হয়। ওতে তো দোষের কিছু নেই।

বরং টিয়া পেটে আসতে কিছুদিন যখন সুধন্যর মা এসে কাছে ছিলেন তিনি মাঝে মাঝে রাগ করতেন;

এত কেন রাত করিস বল দেখি! এখন না হয় আমি আছি, নাহলে এতটুকু মেয়েটা এই রাতদুপুর পর্যন্ত একা একা থাকে।

বাড়ির পাশে বিশাল মাঠ ছিল তখন। বিকেলে ফুটবল খেলা হত। রাত্রে জানলা খুললে চরাচর ডোবানো অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষে কোনও কোনও দিন বেশি রাতে চাঁদ উঠত, কাটা চাঁদ। হলদেটে আবছা আলো, দূরের দিকে জমাট অন্ধকার। মনে হত পৃথিবীর ওইখানেই শেষ। বইপড়ার নেশা তাঁর চিরকাল। সে সময়ে কিছুদিন অবশ্য একটু সমস্যা ছিল, ভারী শরীর নিয়ে বেরিয়ে লাইব্রেরিতে যেতেন না, লজ্জা করত। তবে তাঁর নিজের বইয়ের সঞ্চয়ও খুব কম ছিল না। সে ব্যাপারে সুধন্য কোনওদিন কোনও কথা বলেনি, প্রতিমাসেই কিছু কিছু বই কিনতেন। কোনও ব্যাপার নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করত না সুধন্য। বলেই দিত,

অত ভেবে লাভ কি! বয়সকালে বিয়ে একটা করতে হয়, সবাই করে, তোমাকে চোখেও লেগে গেল, করে ফেললাম। কেন তোমার অসুবিধেটা কি? আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?

কিংবা কখনও বলত, তুমি সব ব্যাপারে অত কি ভাবতে থাক বল তো? সবসময়ে মুখ গোমড়া, যেন সংসারের সব দায়িত্ব তোমারই মাথায় চাপানো আছে। গোমড়া মুখ দেখতে একদম ভালো লাগে না আমার—আরে খাও পিও মৌজ কর—যখন বুড়ো হব তখন মুখ গোমড়া হবে—

এক একদিন হেসে ফেলত শ্রীলা।

আমার মুখ গোমড়া কিনা তুমি জানবে কি করে। কখন মুখ দেখ তুমি?

আসলে দুটো লোকের কেউই খুব ভালো কিংবা খুব খারাপ ছিল না তারা কিন্তু বড্ড বেশি দুরকম ছিল। প্রথম থেকেই কোথায় একটা চিড় রয়ে গিয়েছিল সেটা আর কিছুতেই মেরামত হল না। বরং যেমন দিন গেল সব ব্যাপারে দুজনের মতের অমিল বাড়তেই থাকল। শ্রীনন্দার চাকরি করা নিয়ে তো—

সে অবশ্য অনেক পরের ব্যাপার। তার আগে তো টিয়া জন্মেছে। কি ফুটফুটে দেখতে হয়েছিল। সবাই খুশি। মা বললেন, প্রথম সন্তান মেয়ে হলে বাপের সমৃদ্ধি বাড়ে।

সুধন্য খুব একটা আমল দেয়নি। বলেছিল, ওটা সান্ত্বনার কথা। প্রথমটাকে ছাড় দেওয়া আর কি! আমার ওসবে দরকার নেই, আমার কাছে মেয়ে যা ছেলেও তাই। আপনার মেয়ের সময় কাটানোর একটা ব্যবস্থা হল— এই ঢের—

মা একটু হয়তো অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। পরে শ্রীলাকে বলেছিলেন,

এখন বলুক না, দেখবি মেয়ের টানেই বাড়িতে মন বসতে শুরু করবে।

আচ্ছা, কত বয়স ছিল তখন মায়ের? এই বাহান্ন-চুয়ান্নই তো! মুখের ওপর ছেলের বয়সি একটা ছেলে ওরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বললে মেনে নিত কি করে! হয়তো তখন ওরকমই চলত। কিন্তু কতদিনই বা আগে সেটা? এখন মাঝে মাঝে শ্রীলার মনে হয় দুটো কালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিলেন যেন তাঁরা, নিজেদের সেই বড়ো হয়ে ওঠার সময়ে। আগের যাঁরা তাঁরা বড়ো বেশি মেনে নিতেন বলেই কি কমবয়সীরা অসহিষ্ণু ছিল? সহজেই সঙ্ঘাত হত? সহজ-কঠিন এসব শব্দের কি নির্দিষ্ট মানে আছে কোনও? একজনের কাছে যেটা সহজ অন্যের কাছে হয়তো সেটাই অনেক কঠিন? নাকি বয়েস, সামাজিকতা থেকেই সহিষ্ণুতা ঠিক হয়। কই আজ তিনিও তো লোকটাকে কিছু বলতে পারলেন না। কেবল ওর কথার, প্রশ্নের উত্তর দেননি—একটুই তো। অবহেলা করেছেন সবার সামনে—তাঁর অবহেলা মানে আজকে এসব লোকের হয়তো একটু সামাজিক এমব্যারাসমেন্ট। কিংবা ও হয়তো বুঝতেও পারবে না, ভাববে অনেকের ভিড়ে শ্রীনন্দা ওর কথাগুলো খেয়াল করেননি। ওর তো শ্রীনন্দাকে মনে করে রাখার কথা নয়। মনে নেইও। শ্রীনন্দা নিজে কি কোনওদিন ভেবেছিলেন এরকমভাবে মনে আছে সব কিছু? ভেবেছিলেন একটা মুখের একটা দুপুরের স্মৃতি ধরে এত এত সুতোয় টান পড়বে, এত জট উঠে আসবে? সুধন্যর সঙ্গে দেখা হয়নি কত বছর, শুনেছেন দিল্লিতে থাকে বউ-বাচ্চা নিয়ে। সেই মেয়েটিকেই কি বিয়ে করছে না অন্য কাউকে—সেকথা জানারও কৌতূহল হয়নি কখনও। যা জীবন থেকে বাদ চলে গেছে

মনে মনে তাকে আঁকড়ে রেখে কি হবে। অথচ সুধন্যর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাবার একটা বড়ো দায় কি এই লোকটার নয়?

চিন্তা থেকে মন সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন শ্রীনন্দা। কাল যেসব কাজ আছে সেগুলো মনে মনে হিসেব করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। সকালবেলা একটা আশ্রম দেখতে যাওয়া। কুষ্ঠরোগীদের যে সব বাচ্চা মা-বাবার রোগের ছোঁয়াচ পায়নি সেরকম প্রায় চল্লিশটা বাচ্চাকে নিয়ে থাকেন দুই কেরালিয়ান মহিলা। পাটনারই কোনও এক ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রীর নাকি উদ্যোগ ছিল ব্যাপারটার পেছনে। সেই আশ্রম, তার কাজকর্ম, আর কিছু বাচ্চা রাখা যায় কিনা, যারা আছে তাদের জন্য আরেকটু ভালো ব্যবস্থা করা যায় কিনা—এসব নিয়ে তাঁকে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। তার ওপর ভিত্তি করে হয়তো ইউনিসেফ বা অন্য কোনও ফাউন্ডেশন থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেতে পারে এরা।

ভালো করে দেখে বুঝে তৈরি করতে হবে রিপোর্ট—এ ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রীনন্দা যতদূর সাধ্য সচেতন থাকেন। তারপর কাল সারাদিনের একটা ওয়ার্কশপ আছে। ভারতবর্ষের প্রথম চারটে বাদ দিয়ে দশটা শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই শহরগুলোয় যে সব বাচ্চা একা বা পরিবারের সঙ্গে ফুটপাথে থাকে তাদের বিষয়ে বিশদ খোঁজখবর নিয়ে পরিসংখ্যান তৈরি করা হবে। যে কর্মীরা এই পরিসংখ্যানগুলো তৈরি করবেন তাঁদের নিজেদের মনে যদি কাজটার জন্য ভালোবাসা আর যথেষ্ট দায়িত্ববোধ না থাকে তাহলে কাজটা ঠিকমতোভাবে হওয়া সম্ভব নয়। দুদিনের প্রাথমিক ওয়ার্কশপে এই ধরনের প্রায় পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে তাঁর থাকবার কথা। সমস্ত পরিকল্পনাটা তাদের বুঝিয়ে বলা, এই বাচ্চাগুলোর প্রতি তাদের নিজেদের যে দায়িত্ব সে বিষয়ে আলোচনা করা, কী কী বিষয়ে জানতে হবে, কোন কোন পরিসংখ্যান দরকার, কীভাবে সেগুলো জোগাড় করা ও ক্রস চেক করা যাবে—এই নিয়েই ওয়ার্কশপ। একমাস পর আবার একবার ঘুরে যাওয়া। দেখে যাওয়া কাজটা শুরু হল কিনা, কীভাবে শুরু হল। সব জায়গাতেই টিমের মধ্যে কয়েকজন ছেলেমেয়ে থাকে যারা উদ্যোগী হয়, যাদের উৎসাহ কিংবা বলা ভালো সিরিয়াসনেস বেশি থাকে। সাধারণত এরাই কাজগুলো ঠেলে নিয়ে যায়। তাছাড়া ওই বাচ্চাগুলোর কাছাকাছি গেলে, ওদের কাছ থেকে জানলে বেশিরভাগ কর্মীর মধ্যেই একটা বদল আসে। জীবনের অন্য একটা দিক দেখতে পায়। তিনি নিজে এই ফুটপাথের বাচ্চাদের দেখেছেন—আফগানিস্থানে পাকিস্তানে মালয়েশিয়ায় বার্মায় বাংলাদেশে। একইরকম অসহায় চেহারা একইরকম উদাসীনতার মধ্যে বড়ো হচ্ছে পৃথিবীতে। অনেকবার ভেবেছেন এরা বড়ো হলে এদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে সমাজ? এদের আশপাশ দিয়ে প্রতিদিন যে সামাজিক জীবন বয়ে যাচ্ছে তাতে কি এই বাচ্চাদের কোনও অংশ আছে? অথচ প্রায়ই দেখা যায় ভিখারি নয় এদের ফুটপাথবাসী মা-বাবা অন্তত ভিখারি ছিল না। কোনও না কোনও কারণে জমি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গ্রাম থেকে এসে শহরের ফুটপাথে ঠেকেছে।

সামনের বাচ্চাটা এখন বাবু হয়ে সিটের ওপরে বসে আছে। জানলার বাইরে ঘন অন্ধকার। কখনও বা দূরে কোথাও একঝাঁক আলো কিংবা একটি দুটি টিমটিম লালচে আভা